সূচিপাতা

লেখক পরিচিতি ৬

অনুবাদকের ভূমিকা ১০

ভূমিকা : মানহাজের ব্যাপারে কিছু কথা ১৪

প্রথম অধ্যায় : চিন্তার মরুপ্রান্তর ও ধ্বংসস্তূপ ৩০

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বৈশিষ্ট্য ৫৪

তৃতীয় অধ্যায় : ঐশ্বরিক উৎস ৫৮

চতুর্থ অধ্যায় : স্থিতিশীলতা ৮৮

পঞ্চম অধ্যায় : ব্যাপকতা ১০৮

ষষ্ঠ অধ্যায় : ভারসাম্য ১৩৫

সপ্তম অধ্যায় : ইতিবাচকতা ১৭৩

অষ্টম অধ্যায় : বাস্তবমুখিতা ১৯৩

নবম অধ্যায় : আল্লাহর একত্ব ২১৪

লেখক পরিচিতি

কুরআনের ছায়াতলে জীবন কাটানো এক সৌভাগ্য।
এমন এক সৌভাগ্য—যা কেবল তারাই বুঝবে, যারা এর স্বাদ পেয়েছে।

সাইয়্যিদ ইবরাহীম হুসাইন কুতুব গত শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী ইসলামি চিন্তাবিদদের অন্যতম। তিনি ছিলেন চতুর্দশ হিজরি শতকে ইসলামি পুনর্জাগরণের অগ্রপথিক এবং বৈশ্বিক ইসলামি আন্দোলনের প্রধানতম তাত্ত্বিকদের একজন। সেক্যুলার মডার্নিটির ব্যাপারে তাঁর বিশ্লেষণ ও সমালোচনা অত্যন্ত সমৃদ্ধ, ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী।

সাইয়্যিদ কুতুবের জন্ম ১৯০৬ সালে, মিশরের উসইউতের একটি গ্রামের সম্ভ্রান্ত ধার্মিক পরিবারে। শৈশবেই তিনি পবিত্র কুরআন হিফয করেন এবং ১৯২০ সালে ভর্তি হন কায়রোর বিখ্যাত দারুল উলূমে। ১৯৩৩ সালে সমাপ্ত হয় শিক্ষাজীবন। তাঁর অধ্যয়নের ক্ষেত্র ছিল সাহিত্য ও শিক্ষা। ১৯৩৩ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত তিনি মিশরের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কর্মরত ছিলেন। এই সময়টাতে মিশরের একজন প্রথম সারির সাহিত্য সমালোচক, বুদ্ধিজীবি এবং কবি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। সাহিত্য সমালোচনা, আরবি কবিতা এবং শিক্ষা নিয়ে বেশ কিছু অ্যাকাডেমিক গবেষণামূলক কাজও এ সময়ে তিনি করেছিলেন। এসময়কার বিভিন্ন ম্যাগাজিন ও জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি মিশরের রাজতন্ত্র ও ব্রিটিশ প্রভাবের কড়া সমালোচনা করেন। সরকারবিরোধী লেখালেখির কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে শুরু হওয়া জটিলতার জের ধরে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় অ্যামেরিকাতে। নামে প্রশিক্ষণ সফর হলেও এর মূল উদ্দেশ্য ছিল মিশরের তৎকালীন উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে তাঁকে দূরে রাখা। অ্যামেরিকা সফর তাঁর চিন্তার জগতে ব্যাপক পরিবর্তন আনে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সেক্যুলার মডার্নিটির বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর কাছে।

১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সাইয়্যিদ কুতুব মিশরের ওয়াফদ পার্টির সেক্যুলার জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলেন। এসময় তাঁর চিন্তার ওপর মিশরীয় কবি ও বুদ্ধিজীবি

আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদের ছিল বেশ প্রভাব। ১৯৪৫-এর পর প্রচলিত রাজনীতির ব্যাপারে তাঁর মোহমুক্তি ঘটে এবং তিনি ইসলামি দাওয়াহর ওপর মনোনিবেশ করেন। ১৯৪৮ সাল থেকে তাঁর লেখা ও চিন্তায় ক্রমশ প্রাধান্য পেতে শুরু করে ইসলামের আলোচনা। এসময় থেকে সাইয়্যিদ কুতুবের রচনার মূল বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়ায়—কুরআনের আলোকে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার বিশ্লেষণ এবং পূর্ণাঙ্গ ইসলামি সমাজ ও জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব।

১৯৫০ সালে দেশে ফিরে আসার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চাকরি থেকে সাইয়্যিদ কুতুব পদত্যাগ করেন। ১৯৫২ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানে পতন ঘটে মিশরের তৎকালীন বাদশা ফারুকের। এ অভ্যুত্থানের মূল পরিকল্পনা ছিল ইখওয়ানুল মুসলিমীনের। চল্লিশের দশকের শেষ দিকে ইখওয়ানুল মুসলিমীন মিশরীয় সামরিক বাহিনীর বেশ কিছু অফিসারকে সাথে নিয়ে বিপ্লবের মাধ্যমে সরকার পতনের গোপন পরিকল্পনা গ্রহণ করে। জামাল আব্দুন নাসের ছিল এই অফিসারদের অন্যতম। কিন্তু প্রথম দিকে ইখওয়ানের সাথে থাকলেও পরে অফিসাররা নিজস্ব পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়। ৫২-এর অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জামাল আব্দুন নাসের এবং অন্যান্য অফিসাররা ক্ষমতায় আসে।

এসময় বুদ্ধিজীবি ও চিন্তাবিদ হিসেবে সাইয়্যিদ কুতুবের খ্যাতি দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাঁর ধ্যানধারণাগুলো প্রভাব ফেলতে শুরু করেছিল সমাজের বিভিন্ন স্তরে। অভ্যুত্থানের পেছনে থাকা অনেক ব্যক্তি সাইয়্যিদ কুতুবের একনিষ্ঠ পাঠক ছিল এবং অভ্যুত্থানের আগে তাঁর বাসায় নাসেরসহ আরও অনেকের আসা-যাওয়াও ছিল নিয়মিত। এজন্য অনেকে বলে থাকেন—কুতুব ছিলেন ৫২'র বিপ্লবের তাত্ত্বিক। ইখওয়ানের মতো কুতুবও আশা করেছিলেন ক্ষমতার পরিবর্তনের পর ইসলামি ব্যবস্থার প্রচলন করা হবে। কিন্তু নাসের এবং অফিসারদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন।

ক্ষমতায় আসার পর জামাল আব্দুন নাসের এবং অফিসারদের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় ইখওয়ানুল মুসলিমীনের দমন।

কুতুব তখনো ইখওয়ানে যোগ দেননি। তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তার কারণে নাসের তাঁকে ইখওয়ানের মোকাবিলায় দাঁড় করাতে চাচ্ছিল। এজন্য তাঁকে প্রথমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পরে তথ্য মন্ত্রণালয় এবং শেষপর্যন্ত তাঁর পছন্দের যেকোনো মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। কিন্তু ততদিনে কুতুব বুঝতে পেরেছিলেন—নাসের এবং অন্যান্য অফিসারদের ইসলামি শাসনের প্রতি কোনো আন্তরিকতা নেই, তারা সেক্যুলার শাসনেই আগ্রহী। তিনি সব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং এখানেই নাসের ও অন্যান্য অফিসারদের সাথে তাঁর সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটে। অল্প কিছুদিন পর

ইখওয়ানুল মুসলিমীনে যোগদান করেন সাইয়্যিদ কুতুব। যোগ দেওয়ার প্রায় সাথে সাথেই তাঁকে দাওয়াহ ও প্রকাশনা বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং তিনি ইখওয়ানের উচ্চপদস্থ ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্যে পরিণত হন।

১৯৫৪ সালে ইখওয়ানুল মুসলিমীনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, বন্দি হন কুতুবসহ ইখওয়ানের অন্যান্য প্রধান নেতা এবং অসংখ্য সাধারণ নেতাকর্মী। কুতুবসহ অন্যান্য নেতাকর্মীদের ওপর জেলে ভয়াবহ নির্যাতন চালানো হয়। ১৯৫৫ সালে মিশরের কুখ্যাত তোরা কারাগারে হত্যা করা হয় ইখওয়ানের ৭ জন নেতাকে। একই বছর নাশকতামূলক কার্যকলাপ, সরকারবিরোধী বক্তব্য ও লেখালেখির অভিযোগে সাইয়্যিদ কুতুবকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এক বছর কারাভোগের পর সরকারের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেওয়া হয়—তিনি যদি সংবাদপত্রের মাধ্যমে ক্ষমার আবেদন করেন, তাহলে তাঁকে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে। কুতুব প্রত্যাখ্যান করেন এ প্রস্তাব। পরবর্তী সাড়ে ১১ বছর কুতুব কারাগারেই কাটান এবং সে সময়েই তিনি লেখেন তাঁর সবচেয়ে স্মরণীয় রচনাগুলো।

বন্দি অবস্থাতেই পুরো আরববিশ্ব জুড়ে কুতুবের রচনা এবং খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৬৪ সালের মে মাসে ইরাকের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আব্দুস সালাম আরিফের সুপারিশে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয় তাঁকে। এবছরই তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা মাআলিম ফিত তরীক প্রকাশিত হয়। এ বই ইসলামি আন্দোলনের চিন্তার জগতে এক বিপ্লব তৈরি করে। ১৯৬৫ সালে আবার যখন তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং তাঁর বিরুদ্ধে সরকার পতনের চক্রান্তের অভিযোগ আনা হয়, তখন প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় মাআলিম ফিত তরীক বইটি। পরবর্তী সময়ে ইখওয়ান-ও এ বইয়ের সাথে নিজেদের দূরত্বের ঘোষণা দেয়।

সামরিক ট্রাইবুনাল সাইয়্যিদ কুতুবের ফাঁসির আদেশ দেয়। দেশবিদেশের বিভিন্ন বরেণ্য ব্যক্তি ও উলামা তাঁর মুক্তির জন্য আবেদন জানায় নাসেরের কাছে। সরকারের পক্ষ থেকে আপসের বিভিন্ন প্রস্তাবও দেওয়া হয় তাঁকে। কিন্তু কুতুব তাঁর আদর্শ ও অবস্থান থেকে বিন্দু পরিমাণ সরতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁর বিখ্যাত উক্তি ছিল, 'সালাতে এক আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দেওয়া আঙুল কোনো মিথ্যা ইলাহ-এর শাসনের পক্ষে একটি অক্ষর লিখতেও অস্বীকৃতি জানায়।'

সাইয়্যিদ কুতুবের ২৪টি বই প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় ৩০ টির মতো বই সরকারি বাধার কারণে প্রকাশিত হতে পারেনি। এছাড়া তিনি ৫০০ এর বেশি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত রচনাগুলোর মধ্যে রয়েছে *মাআলিম ফিত তরীক* এবং *ফী যিলালিল কুরআন*। তাঁর ছোট ভাই মুহাম্মাদ কুতুবের বক্তব্য অনুযায়ী, জীবনের শেষ দিকে কুতুব

তাঁর প্রথম দিককার বিভিন্ন লেখার অবস্থান থেকে সরে আসেন এবং ১৯৫৮ থেকে শুরু করে পরবর্তী রচনাগুলোই সাইয়্যিদ কুতুবের সর্বশেষ অবস্থানের প্রতিফলন।

১৯৬৬ সালের ২৯ আগস্ট ভোরে সাইয়্যিদ কুতুবের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। মৃত্যুদণ্ডের আগে তাঁকে কালিমা পড়াতে একজন আযহারি শাইখকে পাঠানো হয় জেলখানায়। কুতুব তাকে লক্ষ করে বলেন,

> অবশেষে আপনি এলেন এই নাটকের অবসান ঘটাতে? মনে রাখবেন, আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর কালিমাকে বিজয়ী করতে চাচ্ছি বলে আমাদের ফাঁসি দেওয়া হচ্ছে, হত্যা করা হচ্ছে। আর আপনারা এই কালিমা বিক্রি করে খাচ্ছেন। শুনে নিন, আমি বলছি—আশহাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর, ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ।
>
> একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনো হক ইলাহ নেই, তাঁর কোনো শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর। আর তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া কোনো উপায় বা শক্তি নেই।

এই ছিলেন সাইয়্যিদ কুতুব রহিমাহুল্লাহ; শহীদ এবং মুজাদ্দিদ, বিইযনিল্লাহ।[১]

উত্তর-ঔপনিবেশিক ইসলামি আন্দোলনের ওপর সাইয়্যিদ কুতুবের প্রভাব ব্যাপক ও বিস্তৃত। পরবর্তী প্রায় সকল ইসলামি আন্দোলন তাঁর চিন্তাধারা দ্বারা কোনো না কোনো মাত্রায় প্রভাবিত হয়েছে। সেক্যুলার মডার্নিটি এবং প্রকৃত ইসলামি জীবনব্যবস্থার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা নিয়ে তাঁর বিশ্লেষণ আল্লাহর ইচ্ছায় মুসলিম উম্মাহর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হয়ে থাকবে।

---

[১] তথ্যসূত্র : Sayyid Qutb : Between Reform and Revolution, Thameem Ushama

অনুবাদকের ভূমিকা

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

নিশ্চয় সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও তাঁর সাহাবিগণের ওপর।

সাইয়্যিদ কুতুব (রহিমাহুল্লাহ) গত শতাব্দীতে ইসলামি জাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর চিন্তার মূল কেন্দ্র ছিল প্রথম প্রজন্মের বিশুদ্ধ ইসলামে ফিরে যাওয়া, পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্যের আগ্রাসনের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের চাপিয়ে দেওয়া শাসনব্যবস্থার বাস্তবতা মুসলিমদের সামনে তুলে ধরা এবং প্রকৃত ইসলামি সমাজ ও জীবনব্যবস্থার প্রতি মানুষকে আহ্বান করা। উপনিবেশ আমল ও উসমানিদের পতনের পর সাইয়্যিদ কুতুবের মতো এত স্পষ্টভাবে এ বিষয়গুলো নিয়ে আর কেউ আলোচনা করেননি।

ইসলামি জীবনব্যবস্থার মূলনীতি বইটি সাইয়্যিদ কুতুবের *খাসায়িসুত-তাসাওউরিল ইসলামি ওয়া মুকাওয়িমাতুহু* (خَصَائِصُ التَّصَوُّرِ الْإِسْلَامِيِّ وَمُقَوِّمَاتُهُ) বইয়ের কিছুটা সংক্ষেপিত অনুবাদ। বইটির প্রথম প্রকাশ ১৯৬০ বা ৬২ সালে। এ সময় কুতুব ছিলেন মিসরের কারাগারে বন্দি। মূল আরবির দুটো ইংরেজি অনুবাদ আছে, বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে সেগুলোকে সামনে রেখে।[২] বইটি সাইয়্যিদ কুতুবের চিন্তার মূল প্রকল্পের সবচেয়ে নিয়মতান্ত্রিক (systematic) উপস্থাপনার একটি।

সাইয়্যিদ কুতুব এ বইটিতে ইসলামি জীবনব্যবস্থাকে তুলে ধরেছেন অন্যান্য ধর্ম ও পশ্চিমা বিভিন্ন মতবাদের সাথে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে। এ উদ্দেশ্যে তিনি ইয়াহূদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু ও জরাথুস্ত্রবাদের মতো ধর্ম বিশ্বাস নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি গ্রীক দর্শন, পুরাণ এবং আধুনিক পশ্চিমা নানা মতবাদের দিকেও মনোযোগ দিয়েছেন।

[২] Basic principles of the Islamic worldview, (২০০৬), অনুবাদক : রামি ডেইভিড; এবং The Islamic Concept and Its Characteristics, (১৯৯২), অনুবাদক : মুহাম্মাদ মুইনুদ্দীন সিদ্দিকী।

পশ্চিমা দর্শন, মতবাদ ও ইতিহাসের আলোচনার ক্ষেত্রে মুহাম্মাদ আল-বাহি এবং আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদের লেখার ওপর নির্ভর করেছেন তিনি। এছাড়া মাওলানা আবুল হাসান আলী নাদভি এবং মুহাম্মাদ আসাদের বেশ কিছু উদ্ধৃতিও বইতে এসেছে। সাইয়্যিদ কুতুব বিশেষভাবে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে—বর্তমান পৃথিবীর সব প্রান্তে; এমনকি মুসলিম দেশগুলোতেও পাশ্চাত্যের চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষা, চিন্তা ও শাসন বিরাজ করছে।

তিনি মনে করেন, পাশ্চাত্য সভ্যতার ইতিহাস হলো প্রান্তিকতার ইতিহাস। বারবার তারা এক প্রান্তিকতা থেকে ছুটে গেছে আরেক প্রান্তিকতার দিকে। রেনেসাঁ ও রিফর্মেশানের সময় থেকে শুরু করে ইউরোপীয় চিন্তার পুরো ইতিহাসকে এক অর্থে চার্চের বিকৃত শিক্ষা ও অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া বলা চলে। ক্যাথলিক চার্চের মাধ্যমে ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর শিক্ষার যে বিকৃতি ঘটেছে, আজ পর্যন্ত মানবজাতিকে তার মূল্য দিতে হচ্ছে। এনলাইটেনমেন্টের যুগে ইউরোপ সিদ্ধান্ত নিল—ধর্ম বিশ্বাস, নৈতিকতাকে বাদ দিয়ে সবকিছুর মাপকাঠি বানানো হবে মানুষকেই। এই চিন্তার গর্ভ থেকে জন্ম হলো ভাববাদ, দৃষ্টবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ, উদারনৈতিকতাবাদ, মার্ক্সবাদসহ নানা দর্শন ও মতবাদের। কিন্তু মানুষের বানানো দর্শন, মতবাদ, ব্যবস্থা সত্যের সন্ধান দিতে পারল না। চার্চের বিরোধিতা করতে গিয়ে স্রষ্টা, পরম ও ধর্মের পুরো ধারণাকেই ইউরোপ কার্যত প্রত্যাখ্যান করে বসল। মানুষ হয়ে পড়ল কেন্দ্র থেকে বিচ্যুত। ফলে মানবজাতি আজ কেন্দ্রচ্যুত হয়ে চিন্তার মরুপ্রান্তরে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে চলছে, পিষ্ট হচ্ছে বুদ্ধিবৃত্তিক আবর্জনার ধ্বংসস্তূপের নিচে। এ সভ্যতাকে সাইয়্যিদ কুতুব বর্ণনা করেছেন 'জাহিলি' বলে।

অন্যদিকে, ইসলাম দেয় সৃষ্টিজগৎ ও মানব-অস্তিত্ব ব্যাখ্যা করার এক পূর্ণাঙ্গ কাঠামো। ব্যক্তি, সমাজ, শাসন, অর্থনীতি, চিন্তা, আধ্যাত্মিকতা, আকীদা সবকিছু আছে এ কাঠামোতে। ইসলাম পূর্ণাঙ্গ ও নিখুঁত, মানবরচিত উপাদান, ধ্যানধারণা কিংবা কাঠামোর অমুখাপেক্ষী। বাস্তবতা, অস্তিত্ব, জ্ঞান, নৈতিকতা, জীবনের উদ্দেশ্য, শাসনের ভিত্তিসহ নানা বিষয়ে ইসলাম স্বতন্ত্র অবস্থান গ্রহণ করে। এ সবকিছুই সামগ্রিকভাবে ইসলামি দ্বীনের অংশ। বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ে কুতুব এ বিষয়গুলো ধাপে ধাপে আলোচনা করেছেন।

সাইয়্যিদ কুতুবের মতে ইসলাম স্থবির নয়। মানবীয় বুদ্ধিমত্তা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান কিংবা সমাজের বিকাশকে নাকচ করে না ইসলাম। তবে ইসলামি জীবনব্যবস্থায় এ সবকিছু ঘটে কিছু অপরিবর্তনীয় মূলনীতি ও বিধানের অধীনে। কুতুব একে তুলনা করেছেন নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট অক্ষ ও কক্ষপথে চলা গ্রহের গতিপথের

সাথে। গতি কিংবা ব্যাসার্ধের পার্থক্যের কারণে এতে পরিবর্তন আসতে পারে, কিন্তু কেন্দ্র এবং অক্ষ কখনো বদলাবে না।

কিন্তু কালক্রমে ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষা ও জীবনব্যবস্থার মধ্যে ঢুকে পড়ে বিজাতীয় নানা উপাদান ও ধ্যানধারণা। মলিন হয়ে পড়ে প্রথম প্রজন্মের সহজ-সরল এবং পূর্ণাঙ্গ দ্বীনের ধারণা। তার সাথে এক পর্যায়ে যুক্ত হয় পাশ্চাত্যের ঔপনিবেশিক আগ্রাসন। বর্তমানে ইসলামের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর বিশাল একটি অংশের এই জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত এবং খণ্ডিত। দ্বীন ইসলামকে তারা অল্প কিছু ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচার-বিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ মনে করে।

এ বইয়ে কুতুবের উদ্দেশ্য ছিল বাহ্যিক সব প্রভাব ও উপাদানকে প্রত্যাখ্যান করে ইসলামের আদি ও অকৃত্রিম অবস্থান এবং এর সরল, বিশুদ্ধ ও সামগ্রিক শিক্ষাকে তুলে ধরা। এ কাজটি তিনি করেছেন কুরআনের আলোকে ইসলামি জীবনব্যবস্থার ৭টি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের আলোচনার মাধ্যমে। এ বইয়ের আলোচনার সাথে গভীর সম্পর্ক আছে *ফী যিলালিল কুরআন* এবং বিশেষভাবে *মাআলিম ফিত তরীক*-এর। 'মাআলিম' যদি হয় ইসলামি পুনর্জাগরণের নকশা, তাহলে 'তাসাওউর'-কে বলতে হবে সেই জাগরণের ভিত্তি।

সাইয়্যিদ কুতুব এ বইয়ের আরেকটি খণ্ড রচনা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কাজ শেষ করার আগেই তাঁর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়। মৃত্যুর আগে তিনি ৫টি অধ্যায় সম্পন্ন করেন। ১৯৮৬ সালে তাঁর ভাই মুহাম্মাদ কুতুব এই পাঁচটি অধ্যায় এবং আরও দুটি অধ্যায়ের ওপর কুতুবের নোট একত্রিত করে *মুকাওয়িমাতুত-তাসাওউরিল ইসলামি* (مُقَوِّمَاتُ التَّصَوُّرِ الْإِسْلَامِيِّ) নামে প্রকাশ করেন।

মূল বইয়ের বেশ কিছু জায়গায় কিছু বাক্য এবং অনেক সময় পুরো প্যারাগ্রাফের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এধরনের পুনরাবৃত্তিগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে যথাসম্ভব। এছাড়া পাশ্চাত্য চিন্তার খণ্ডন করতে গিয়ে; বিশেষ করে গ্রীক দর্শন এবং জার্মান ভাববাদ (আইডিয়ালিসম)-এর বিশ্লেষণে আল-আক্কাদ ও আল-বাহির লেখনী থেকে বেশ জটিল ও তাত্ত্বিক কিছু আলোচনা কুতুব নিয়ে এসেছেন। এর মধ্যে সর্বাধিক জটিল এবং তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। তবে লেখকের আলোচনার মূল গতিপথ ও বক্তব্য যেন বদলে বা হারিয়ে না যায়, তা খেয়াল রাখা হয়েছে সব ক্ষেত্রেই। ভাষাগতভাবে চেষ্টা করা হয়েছে মূলভাবের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে যথাসম্ভব সহজভাবে আলোচনাকে ফুটিয়ে তোলার এবং সাফল্য শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে।

***

এ বই লেখার পর কেটে গেছে ছয় দশক। ইসলামের সাথে পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব, আল্লাহর নির্ধারিত জীবনব্যবস্থার সাথে মানবরচিত ব্যবস্থার সাংঘর্ষিকতা এবং ইসলামের প্রতি এ ব্যবস্থা ও এর ব্যবস্থাপকদের বিদ্বেষ স্পষ্ট হয়েছে সময়ের সাথে সাথে। কিন্তু পাশ্চাত্যের অসুস্থতা ও বিদ্বেষ যত স্পষ্ট হয়েছে, ততই মুসলিমদের বিশাল এক অংশ ঝুঁকেছে পাশ্চাত্যের দিকে। উদ্গ্রীব হয়ে গ্রহণ করেছে পাশ্চাত্যের চকচকে নানা আবর্জনা। দুঃখজনকভাবে এর মধ্যে তারাও শামিল আছেন, যারা সাইয়্যিদ কুতুবের আদর্শ অনুসরণের দাবি করে থাকেন। নানা অজুহাতে সাংঘর্ষিক নানা মতবাদ ও পদ্ধতিকে জোড়াতালি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ইসলামের সাথে। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে উম্মাহর মাঝে বিজাতীয় ধ্যানধারণার প্রভাব আর সত্য-মিথ্যার মিশ্রণের প্রবণতা। তাই সাইয়্যিদ কুতুবের এ বই সেই সময়ের চাইতেও আজ বেশি প্রাসঙ্গিক, আরও বেশি জরুরি। সাইয়্যিদ কুতুবের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে,

> আমাদের কথাগুলো রয়ে যাবে প্রাণহীন, নিষ্ফলা, আবেগশূন্য—যতক্ষণ না এ কথাগুলোর ফলস্বরূপ আমরা জীবন দিচ্ছি;
>
> তারপর শব্দগুলোতে প্রাণের সঞ্চার হবে, মৃত হৃদয়গুলোতে বাসা বাঁধবে ওরা, আবার জীবন্ত করে তুলবে সেগুলো।

আমরা দুআ করি—সাইয়্যিদ কুতুবের শব্দগুলোর মতো পাঠকদের চিন্তায়ও যেন মহান আল্লাহ প্রাণ সঞ্চার করেন, হৃদয়গুলোকে যেন তিনি তাঁর পরম করুণায় করে তোলেন সত্যের প্রতি জীবন্ত।

নিশ্চয় সাফল্য কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং সকল প্রশংসাও একমাত্র তাঁরই। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবি মুহাম্মাদ ﷺ, তাঁর পরিবার ও সাহাবিগণের ওপর।

আসিফ আদনান
রজব ১৪৪৪, ফেব্রুয়ারি ২০২৩

ভূমিকা

মানহাজের ব্যাপারে কিছু কথা

বেশ কিছু কারণে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ[৩] এবং এর বৈশিষ্ট্যগুলো জানা জরুরি।

একজন মুসলিমের জন্য এটি জরুরি, কারণ এই ওয়ার্ল্ডভিউ থেকে সে অস্তিত্বের ব্যাপারে একটি সার্বিক ব্যাখ্যা পায়। প্রত্যেক মানুষকে স্রষ্টা, সৃষ্টি এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যেকার সম্পর্কের বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ এই বাস্তবতাগুলোর একটা সামগ্রিক ব্যাখ্যা দেয়। আর এই সর্বাঙ্গীন ব্যাখ্যার ভিত্তিতেই একজন মুসলিম দুনিয়াকে এবং দুনিয়াতে নিজের অবস্থানকে বোঝে।

মহাবিশ্বে মানুষকে একটি কেন্দ্রীয় অবস্থান দেওয়া হয়েছে। এই সত্যকে চেনা ও মানবজীবনের উদ্দেশ্যকে জানার জন্যও ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ প্রয়োজন। কারণ এই জ্ঞানের ভিত্তিতেই মানুষ মহাবিশ্বে তার ভূমিকা, কাজের ক্ষেত্র, সীমানা এবং স্রষ্টার সাথে তার নিজের সম্পর্ককে বুঝতে শেখে।

যেকোনো ওয়ার্ল্ডভিউকে স্রষ্টা, সৃষ্টি এবং মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নিয়ে মৌলিক কিছু

---

[৩] ওয়ার্ল্ডভিউ (worldview) : মূল আরবিতে সাইয়্যিদ কুতুব তাসাওউর (اَلتَّصَوُّرُ الْإِسْلَامِيُّ) ব্যবহার করেছেন। সাধারণত তাসাওউর শব্দের অর্থ করা হয় 'concept'/'conception' বা ধারণা হিসেবে। তবে লেখক এ শব্দটিকে আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। তিনি ইসলামি তাসাওউর বলতে বুঝিয়েছেন কুরআন ও সুন্নাহ থেকে পাওয়া অস্তিত্বের সামগ্রিক ব্যাখ্যাকে। যে ব্যাখ্যার মধ্যে স্রষ্টা, সৃষ্টিজগৎ, মানুষের উৎস ও ভূমিকা, জীবনের উদ্দেশ্য, নৈতিকতা, সমাজ, শাসন—সবই অন্তর্ভুক্ত। লেখক যে অর্থে তাসাওউর শব্দটি ব্যবহার করেছেন অর্থের দিক থেকে 'ধারণা', 'দৃষ্টিভঙ্গি' ইত্যাদি শব্দের তুলনায় ইংরেজি ওয়ার্ল্ডভিউ (worldview) শব্দটি তার সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। দুঃখজনকভাবে ওয়ার্ল্ডভিউ শব্দের যেসব বাংলা করা হয়েছে, সেগুলো হয় অত্যন্ত অপ্রচলিত হবার কারণে অচেনা প্রায়, অথবা মূলভাব প্রকাশে ব্যর্থ কিংবা দুটোই। তাই অনুবাদে 'ওয়ার্ল্ডভিউ' শব্দটিই ব্যবহার করা হয়েছে। সংক্ষেপে ওয়ার্ল্ডভিউ হলো :

স্রষ্টা, মহাবিশ্ব, মানুষ, ইতিহাস, জীবনমৃত্যু, জ্ঞানসহ নানা বিষয়ে মৌলিক বিশ্বাসের সমষ্টি। এটি চিন্তার ওই কাঠামো, যার সাপেক্ষে, যার মাধ্যমে এবং যার ভেতরে মানুষ বাস্তবতাকে বোঝার ও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করে। ওয়ার্ল্ডভিউ হলো ওই লেন্স, ওই চশমা, যার ভেতর দিয়ে আমরা পৃথিবীকে দেখি। প্রত্যেকের যেমন নিজস্ব ভাষা থাকে, তেমনিভাবে প্রত্যেকের একটা ওয়ার্ল্ডভিউ থাকে। হয়তো তারা সেটাকে 'ওয়ার্ল্ডভিউ'-এর মতো গালভরা কোনো শব্দ হিসেবে চেনে না, কিন্তু শব্দের পেছনের জিনিসটা কমবেশি সবার মধ্যেই থাকে। (অনুবাদক)

প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। এই বিষয়গুলোই সংজ্ঞায়িত করে দেয় মানুষের জীবনযাত্রার ধরন, ঠিক করে দেয় তা কোন ধরনের জীবনব্যবস্থার জন্ম দেবে। কাজেই জীবনব্যবস্থার ভিত্তি হলো এই সামগ্রিক ব্যাখ্যা বা ওয়ার্ল্ডভিউ। আর ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ভিত্তি গড়ে ওঠে এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর উত্তরের ওপর। ত্রুটিপূর্ণ ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা ওয়ার্ল্ডভিউ থেকে জন্ম নেয় জোড়াতালি দেওয়া জীবনব্যবস্থা, অগভীর শেকড়ের গাছের মতো খুব সহজে যা ভেঙে পড়ে। যতদিন টিকে থাকে, জোড়াতালির ব্যবস্থা ততদিন জন্ম দিতে থাকে দুঃখ, কষ্ট ও দুর্দশার। কারণ এধরনের ব্যবস্থা মানুষের প্রকৃতি এবং বাস্তব চাহিদাগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক। আজকের সব জীবনব্যবস্থার ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য; বিশেষ করে পশ্চিমা দেশগুলোতে অনুসৃত তথাকথিত 'প্রগতিশীল' জীবনব্যবস্থার ক্ষেত্রে।[৪]

দ্বীন[৫] ইসলাম নাযিল হয়েছে এক বিশেষ ধরনের উম্মাহ গড়ে তোলার জন্য। এমন এক উম্মাহ, যা মানবজাতিকে আলোর পথ দেখাবে, মহান আল্লাহর নির্ধারিত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে পৃথিবীতে। এই উম্মাহ মানবজাতিকে মুক্ত করবে বিচ্যুতি, পথভ্রষ্টতা, কলুষিত নেতৃত্ব, মিথ্যে আদর্শ আর মতাদর্শের কবল থেকে। মানবজাতি আজ দুর্দশাগ্রস্ত। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ ও এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো আঁকড়ে ধরার মাধ্যমে একজন মুসলিম এই বিশেষ উম্মাহর অগ্রগামী সদস্যে পরিণত হয়। এমন সদস্য যে মানবজাতিকে নেতৃত্ব দিতে পারে, উদ্ধার করতে পারে বর্তমান অন্ধকার থেকে।

মুসলিমদের জীবনের অন্যতম প্রধান চালিকা শক্তি ইসলামি আকীদা, ওয়ার্ল্ডভিউ এবং এগুলো থেকে গড়ে ওঠা ইসলামি জীবনব্যবস্থা। অস্তিত্বের এই সামগ্রিক ব্যাখ্যা আমাদের সামনে তুলে ধরে কুরআন। মানবপ্রকৃতির কোনো দিক, কোনো অক্ষ সেখানে বাদ যায় না। মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, ইন্দ্রিয় এবং অন্তর্দৃষ্টির মতো বিভিন্ন দিক আলোচিত হয় সেখানে। আলোচিত হয় বস্তুজগৎও। এই সব দিকগুলোর ব্যাপারে কুরআনের অবস্থান ও দিকনির্দেশনা মানবপ্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ এই দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন আল্লাহ, যিনি আসমান ও জমিনসমূহের মালিক, মানুষের সৃষ্টিকর্তা।

মুসলিমদের প্রথম প্রজন্ম তাঁদের জীবনকে গড়ে নিয়েছিলেন সরাসরি কুরআন থেকে নেওয়া এই ওয়ার্ল্ডভিউয়ের আঙ্গিকে। তাঁরা একে গ্রহণ করেছিলেন পূর্ণাঙ্গভাবে। এক্ষেত্রে তাঁরা অনন্য। তাঁদের মতো পূর্ণাঙ্গভাবে আর কোনো প্রজন্ম এই ওয়ার্ল্ডভিউকে আঁকড়ে ধরতে পারেনি। আল্লাহ তাঁদের পুরস্কৃত করেছিলেন, বসিয়েছিলেন মানবজাতির

---

[৪] এই লেখকের আল-ইসলাম ওয়া মুশকিলাতুল হাদারা (اَلْإِسْلَامُ وَمُشْكِلَاتُ الْحَضَارَةِ) এবং অ্যালেক্সিস কারেলের Man the Unknown—বই দুটি দ্রষ্টব্য।

[৫] আরবি দ্বীন শব্দটিকে সাধারণত অনুবাদ করা হয় ধর্ম বা religion হিসেবে। কিন্তু এ দুটো শব্দই মূলত ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান বোঝায়। দ্বীন শব্দটির অর্থ আরও ব্যাপক। দ্বীনের ভেতর মানবজীবনের সব দিক অন্তর্ভুক্ত।

নেতৃত্বের আসনে। মন ও মস্তিষ্ক, সমাজ ও শাসন—প্রতিটি ক্ষেত্রে এমন এক ব্যবস্থা তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, যার কোনো তুলনা, যার কাছাকাছি কোনো দৃষ্টান্ত ইতিহাসে এর আগে কিংবা পরে পাওয়া যায় না। এই প্রজন্মের দিকনির্দেশনার প্রধান উৎস ছিল কুরআন। তাঁরা ছিলেন কুরআনের প্রজন্ম। রদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাঈন।

ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখুন, এই জাতির উদ্ভব একটি কিতাবের ভিত্তির ওপর। এই কিতাবই তাঁদের উৎস এবং উদ্দেশ্য। এই কিতাবই পথপ্রদর্শনকারী, মাপকাঠি। আর কিতাবের শিক্ষা কীভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে, তার দৃষ্টান্ত হলো নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহ। কুরআনের নির্দেশনা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের ফসল হলো সুন্নাহ। এই হলো সম্পূর্ণ পথ ও পদ্ধতি। মা আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-কে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল। জবাবে খুব অল্প কথায় আমাদের মা গভীর এক বাস্তবতাকে তুলে ধরেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

> তাঁর চরিত্র ছিল আল-কুরআন।[৬]

কিন্তু পরের প্রজন্মগুলো একটু একটু করে কুরআন থেকে দূরে সরে গেল। কুরআনের ছায়াতল থেকে সরে গেল তাদের অবস্থান। বাড়ল কুরআনের পথ আর দিকনির্দেশনার সাথে দূরত্ব। কুরআন নাযিলের ফলে যে পরিবেশ, মূল্যবোধ ও পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কুরআনের শিক্ষাকে পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। ইসলামের প্রথম প্রজন্ম এমন এক পরিস্থিতিতে কুরআনকে আঁকড়ে ধরেছিলেন, যখন তাঁরা দুনিয়ার বুকে তাওহীদের শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য করছিলেন সংগ্রাম। এ পথে তাদের সহ্য করতে হয়েছিল অনেক দুঃখ, কষ্ট এবং নির্যাতন। জাহিলিয়্যাহর[৭] মোকাবিলায় তাদের লড়াই করতে হয়েছিল, আত্মত্যাগ করতে হয়েছিল। তাঁরা বহন করছিলেন পর্বতসম এক দায়িত্ব। তীব্র পরিশ্রম ও সংগ্রামের এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে

---

[৬] মুসলিম, ৭৪৬।

[৭] শাব্দিকভাবে 'জাহিলিয়্যাহ' এসেছে (اَلْجَهْلُ) থেকে, যার অর্থ ইলমহীন অবস্থা বা অজ্ঞতা। ইসলামি ইতিহাসে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আবির্ভাবপূর্ব সময়কালকে আইয়্যামে জাহিলিয়্যাহ বা অজ্ঞতার যুগ নামে অভিহিত করা হয়। এই সময়কালের সাথে বর্তমানের মৌলিক পার্থক্য আছে। বর্তমানে মহান আল্লাহর নাযিলকৃত দ্বীন ইসলাম আমাদের সামনে আছে, যা ওই সময়ে ছিল না। তবে এই বিশেষ অর্থে ছাড়াও জাহিলিয়্যাহ একটি নির্দিষ্ট অবস্থা বোঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন : কোনো সমাজ বা সভ্যতা আল্লাহর দ্বীন ও বিধান থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য কিছু গ্রহণ করাকে ইসলামের বদলে জাহিলিয়্যাহকে গ্রহণ করে নেওয়া বলা যেতে পারে। সাইয়্যিদ কুতুবের নিজের উদ্ধৃতি থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তিনি লিখেছেন,

'জাহিলিয়্যাহ ইতিহাসের কোনো নির্দিষ্ট যুগের নাম নয়, বরং এটা একটা অবস্থার নাম। সমাজে বা রাষ্ট্রে এর বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া গেলেই তাকে জাহিলিয়্যাহ বলা যাবে। জাহিলিয়্যাহর মূল উপাদান হলো জীবনযাপনের জন্য আল্লাহর বিধান ও শারীআকে উপেক্ষা করে মানুষের আইন, খেয়ালখুশি এবং মানুষের শাসনের আনুগত্য করা; চাই তা কোনো ব্যক্তি, শ্রেণি জাতি বা নির্দিষ্ট সময়কার গোটা মানব প্রজন্মের হোক না কেন। আল্লাহর আইন ও শারীআর বাইরে যা কিছু আছে, তা মানুষের খেয়ালখুশি ছাড়া আর কিছু নয়।' সূত্র : সাইয়্যিদ কুতুব, ফী যিলালিল কুরআন, সূরা মায়িদার ৫০ নম্বর আয়াতের আলোচনা থেকে। (অনুবাদক)

না গেলে প্রথম প্রজন্ম যেভাবে কুরআনকে বুঝেছিলেন, পুরোপুরি সেভাবে বোঝা সম্ভব নয়।

কুরআনের শিক্ষার তাৎপর্য এবং মর্ম অনুধাবনের ক্ষেত্রে মূল সমস্যা কুরআনের আয়াত কিংবা আয়াতের শব্দগুলোর অর্থ বোঝা নিয়ে নয়। মূল সমস্যা হলো—কুরআন নাযিল হবার সংগ্রামপূর্ণ পরিস্থিতিতে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছ থেকে আয়াতগুলো শোনার সময় যে অনুভূতি, চিন্তা এবং অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রথম প্রজন্মের মুসলিমরা অতিক্রম করেছিলেন, তা পুনর্নির্মাণের ক্ষমতা আমাদের মনের নেই। তাঁদের কুরআনের অভিজ্ঞতা আর আমাদের অভিজ্ঞতা এক নয়। তাঁদের অনুভূতি আর আমাদের অনুভূতি আলাদা। তাই কুরআনকে তাঁরা যেভাবে গ্রহণ করেছিলেন, অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়ন করেছিলেন, সেভাবে আমরা করি না।

তাদের সংগ্রাম ছিল জিহাদ—ভয়ভীতি, কামনাবাসনার সাথে লড়াই এবং বাহ্যিক শত্রুর সাথে লড়াই। ভয়, আশা, পরিশ্রম আর আত্মত্যাগ ছিল এই সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই সংগ্রাম ছিল উত্থান-পতনের এক চক্র। এই প্রজন্ম মক্কাতে ইসলামের দাওয়াহর সূচনা দেখেছিলেন। মক্কাতেই তাঁরা সহ্য করেছিলেন কষ্ট ও নির্যাতন। তাঁরা দুর্বল এবং দরিদ্র ছিলেন। তাদের একঘরে করে রাখা হয়েছিল। শিআবে আবী তালিবে অবরুদ্ধ ছিলেন তাঁরা। ক্ষুধা, ভীতি, নির্যাতন, সামাজিক বয়কট—নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁদের। এক আল্লাহর ওপর ভরসা করা ছাড়া তাঁদের করার মতো আর কিছুই ছিল না।

তারপর তাঁরা মদীনাতে গেলেন। তাঁরা ছিলেন মদীনাতে ইসলামি উম্মাহ, সমাজ ও শাসনের গোড়াপত্তনের সাক্ষী, এ প্রকল্পের সক্রিয় সদস্য। তাঁদের মোকাবিলা করতে হয়েছিল বিশ্বাসঘাতকতা, নিফাক আর চক্রান্ত। তাঁরা দেখেছিলেন বদর, উহুদ, খন্দকের যুদ্ধ। দেখেছিলেন হুদাইবিয়া, মক্কা বিজয় আর তাবুকের দিনগুলো। তাঁরা বেঁচে ছিলেন এমন এক সময়ে, যখন ইসলামি জাতির জন্ম ও বিকাশ ঘটছিল। তাঁরা এই প্রক্রিয়ার সক্রিয় অংশ ছিলেন এবং এই পুরো সময় জুড়ে তাদেরকে লড়াই করতে হয়েছিল নিজেদের নফসের সাথেও।

এমন পরিস্থিতিতে কুরআন নাযিল হয়েছিল অনুপ্রেরণা ও গভীর অর্থসহ। কুরআন ছিল জীবন্ত দিকনির্দেশনা। প্রতিটি অক্ষর আর শব্দের অর্থ ও তাৎপর্যকে এই মহান প্রজন্ম আত্মস্থ করেছিলেন। ইসলামি জীবনব্যবস্থাকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রত্যেক প্রচেষ্টাকে নিঃসন্দেহে এমন পরিস্থিতি পার হতে হবে। আর তখনই কুরআন মানুষের হৃদয়ের সামনে তাঁর রহস্যগুলো প্রকাশ করবে, তাঁর সম্পদগুলো তুলে ধরবে, চারদিকে ছড়িয়ে দেবে তাঁর দিকনির্দেশনা আর আলো।

এমন পরিস্থিতিতেই মহান আল্লাহর এই বার্তাকে প্রথম প্রজন্মের মুসলিমরা গ্রহণ করেছিলেন,

> তারা ইসলাম গ্রহণ করে আপনাকে ধন্য করেছে মনে করে। বলুন, 'তোমরা ইসলাম গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করেছ মনে করো না, বরং আল্লাহ ঈমানের দিকে পরিচালিত করে তোমাদেরকে ধন্য করেছেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।' (সূরা হুজুরাত, ৪৯ : ১৭)

এবং তাঁর এই উপদেশ আত্মস্থ করেছিলেন,

> হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তিনি তোমাদেরকে তোমাদের জীবন সঞ্চারক বস্তুর দিকে আহ্বান করেন। আর জেনে রেখো, আল্লাহ মানুষ ও তার হৃদয়ের মাঝে অন্তরায় হন। আর নিশ্চয় তাঁর নিকট তোমাদেরকে সমবেত করা হবে। তোমরা সেই ফিতনাকে ভয় করো, যা তোমাদের মধ্যকার কেবল জালিম লোকেদেরকেই আক্রমণ করবে না। আর জেনে রেখো, নিশ্চয়ই আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর। স্মরণ করো সে সময়ের কথা, যখন তোমরা ছিলে সংখ্যায় অল্প। দুনিয়াতে তোমাদেরকে দুর্বল হিসেবে গণ্য করা হতো। তোমরা আশঙ্কা করতে, লোকেরা তোমাদেরকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন, নিজ সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছেন এবং তোমাদেরকে পবিত্র রিয্‌ক দান করেছেন; যাতে তোমরা (তাঁর নির্দেশ পালনের মাধ্যমে) কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। (সূরা আনফাল, ৮ : ২৪-২৬)

তাঁরা আল্লাহর এই কথার সত্যতার সাক্ষ্য দিয়েছিলেন,

> আর অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে বদরে সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে হীনবল। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করে চলো, যেন তোমরা শোকরগুজার হতে পারো। (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১২৩)

তাঁরা হিকমাহর সত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন,

> আর তোমরা নিরাশ হয়ো না, বিষণ্ণ হয়ো না; যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমরাই বিজয়ী হবে। যদি তোমাদেরকে আঘাত স্পর্শ করে, অনুরূপ আঘাত তো অপর পক্ষকেও স্পর্শ করেছিল। (জয়-পরাজয়ের) এ দিনগুলোকে আমি মানুষের মধ্যে আবর্তিত করে থাকি, যাতে আল্লাহ ঈমানদারদেরকে জেনে নেন এবং তোমাদের মধ্য থেকে শহীদদেরকে গ্রহণ করেন। আর আল্লাহ জালিমদেরকে ভালোবাসেন না। এবং (এ জন্যও) যেন আল্লাহ মুমিনদেরকে

> সংশোধন করেন এবং নিশ্চিহ্ন করেন কাফিরদের। তোমরা কি ভেবেছ যে, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ আল্লাহ এখনো পর্যন্ত পরখ করেননি তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কারা ধৈর্যশীল। (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৩৯-১৪২)

এবং অনুধাবন করেছিলেন এই অনুপ্রেরণার অর্থ,

> অবশ্যই তোমরা তোমাদের ধনসম্পদ ও জীবন সম্পর্কে পরীক্ষিত হবে। আর অবশ্যই তোমরা শুনবে তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের পক্ষ থেকে এবং মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক কষ্টদায়ক কথা। আর তোমরা যদি ধৈর্যধারণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে অবশ্যই তা হবে দৃঢ় সংকল্পের কাজ। (সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৮৬)

আল্লাহর এই বার্তাগুলোর প্রকৃত তাৎপর্য তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ আল্লাহ তাঁর কুরআনে এমন ঘটনার কথা বলছিলেন, যেগুলো ঘটছিল তাঁদের চোখের সামনে। যেগুলো ছিল তাদের জীবনের অংশ। সময় কিংবা স্থানের দূরত্ব ছিল না, পরিস্থিতিরও ভিন্নতা ছিল না। আজ যারা একই ধরনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, কেবল তাদের পক্ষেই সম্ভব পরিপূর্ণভাবে কুরআনের অর্থ ও বার্তাকে ধারণ করা। কুরআনের ওয়ার্ল্ডভিউ এমন লোকেদের চিন্তা, অনুভূতি ও জীবনের অবিচ্ছিন্ন অংশে পরিণত হয়। তারা কুরআন থেকে এই ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সত্যতার স্বাদ আস্বাদন করতে পারে। কারণ এই ওয়ার্ল্ডভিউ তাঁদের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতায় জীবন্ত। সবকিছুকে তাঁরা এর আলোতে দেখে। তবে এমন মানুষের সংখ্যা কম।

লোকেরা আজ কুরআনের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। মানুষ আজ এমন এক পরিস্থিতির মধ্যে বাস করছে, যার সাথে ইসলামপূর্ব জাহিলিয়াতের বিভিন্ন মিল পাওয়া যায়। তাই আল্লাহ, মহাবিশ্ব, মানুষ ও মানবজীবনের ব্যাপারে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মানুষের সামনে তুলে ধরা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা এটি তুলে ধরব সরাসরি কুরআন থেকে। পাশপাশি যুক্ত করব কিছু ব্যাখ্যা ও প্রাসঙ্গিক আলোচনা। তবে আমাদের আলোচনা কোনোভাবেই কুরআনের বিকল্প হতে পারে না। বরং এই আলোচনার উদ্দেশ্য মানুষকে কুরআনের কাছে আনা, যাতে তাঁরা নিজেরা কুরআনের সাথে সম্পর্ক গড়ে নিতে পারে এবং কুরআন থেকে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের গভীর সত্যগুলো অনুসন্ধান করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

এখানে একটি কথা পরিষ্কার করা দরকার। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউকে বোঝার এ চেষ্টার উদ্দেশ্য নিছক কেতাবি জ্ঞান অর্জন নয়। লাইব্রেরিগুলোতে 'ইসলামি চিন্তা' আর

'ইসলামি দর্শন'-এর শিরোনামে শত শত বই আছে। সেই লম্বা তালিকায় আরেকটি বই যুক্ত করার ইচ্ছে আমাদের নেই। শীতল তাত্ত্বিকতা, নিছক বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা কিংবা 'সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ' করা নিয়ে আমরা আগ্রহী নই। এধরনের তুচ্ছ এবং সস্তা আলোচনাতে সময় এবং শ্রম খরচ করার অর্থ হয় না।

আমরা জ্ঞানকে শক্তিতে পরিণত করতে চাই। এমন শক্তি, যা মানুষকে উদ্‌বুদ্ধ করবে পৃথিবীতে তার উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়ন করতে। জ্ঞানকে অতিক্রম করার পর যে আন্দোলন তৈরি হয়, আমরা সেই আন্দোলনকে আনতে চাই। আমরা মানুষের ভেতরে ঘুমিয়ে পড়া বিবেককে জাগাতে চাই, যেন সে ওহির আলোতে নিজ সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারে। আমরা চাই, মানুষ তাঁর জীবনের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্যকে বুঝুক। ফিরে আসুক রবের দিকে, তাঁর নির্ধারিত পথে। আল্লাহ তাআলা বনী আদমকে সম্মানিত করেছেন। আমরা চাই, মানুষ সেই সম্মানের উপযোগী জীবনব্যবস্থায় ফিরে আসুক। যেভাবে এই উম্মাহর প্রথম প্রজন্ম ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউকে বাস্তবায়ন করেছিলেন, এর ভিত্তিতে সত্য, কল্যাণ, আদল, ইনসাফ ও ভারসাম্যের পথে এগিয়ে গোটা মানবজাতিকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন; আমরা চাই উম্মাহ আবারও সেই নেতৃত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করুক।

প্রথম প্রজন্মের ওয়ার্ল্ডভিউ এবং জীবনব্যবস্থা ছিল বিশুদ্ধ। কিন্তু ইসলামের বিস্তৃতির সাথে সাথে অন্যান্য ওয়ার্ল্ডভিউ, জীবনব্যবস্থা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলিমদের সংস্পর্শ আর লেনদেন বাড়ল। ইসলামি ইতিহাসের প্রথম দিক ছিল দাওয়াহ, জিহাদ এবং সংগ্রামের। সময়ের পালাবদলে সংগ্রামের বদলে এক পর্যায়ে এল সহজতা ও আরাম-আয়েশের যুগ। এছাড়া উসমান (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতের পর সৃষ্ট ফিতনার সময়ে বিভিন্ন মতপার্থক্য ও চিন্তাধারা জন্ম নিল। এই মতপার্থক্যগুলো থেকে একসময় জন্ম নিল বিভিন্ন ভ্রান্ত ফিরকাও।

সময় তার আপন গতিতে এগুতে থাকল। বাড়ল বিচ্যুতিও। ইসলামি ভূখণ্ডের লোকেদের অনেকে গ্রীক দর্শন আর খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন ফিরকার ধর্মতাত্ত্বিক তর্কবিতর্ক নিয়ে পড়তে শুরু করল। আকীদা নিয়ে যেসব দার্শনিক-তর্কবিতর্ক এর আগে খ্রিষ্টধর্মকে জর্জরিত করেছিল, সেগুলো এবার মুসলিম বিশ্বে আমদানি করা হলো। আব্বাসি যুগের বাগদাদে এবং উমাইয়্যাহ শাসিত আন্দালুসে এসব জল্পনাকল্পনা আর তর্ক বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠল। এই বুদ্ধিবৃত্তিক অসংযমের প্রভাবে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এমন কিছু বিচ্যুতি ও প্রবণতা দেখা দিলো, যা ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সাথে একেবারেই বেমানান।

বিশুদ্ধ ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ এসেছিল বিচ্যুতি, অনুমাননির্ভর দার্শনিক আলোচনা আর অনর্থক তর্কবিতর্ক থেকে মানুষকে মুক্ত করতে। দার্শনিক অনুমানের বিভ্রান্তির আর জল্পনাকল্পনার মরুপ্রান্তর থেকে বের করে এনে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ মানুষের শক্তি ও

বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়েছিল সত্য, ন্যায় ও বিশুদ্ধতার ভিত্তি নির্মাণের কাজে; গঠনের প্রকল্পে। গন্তব্যহীন ছুটোছুটি থেকে মানুষকে রক্ষা করেছিল ইসলাম। কিন্তু একসময় ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সাথে বিভিন্ন বিচ্যুতি এবং বিজাতীয় উপাদান যুক্ত করা হলো।

বিজাতীয় সংস্কৃতির সাথে মেলামেশার ফলে তৈরি হওয়া নানা বিচ্যুতির কারণে এক দল মুসলিম আলিম মনে করলেন, কালামশাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের মাধ্যমে এসব বিপথগামিতার জবাব দেওয়া দরকার। মহান আল্লাহর সিফাত, তাঁর ইচ্ছা ও শক্তি, কুরআন, মানুষের কাজ, পুরস্কার, শাস্তি, তাওবা ইত্যাদি নিয়ে তৈরি হলো নানা ধরনের ব্যাখ্যা, যুক্তি আর বিশ্লেষণ। জন্ম নিল নানা বিতর্ক। তর্কবিতর্কগুলো খুব দ্রুত বিবাদে পরিণত হলো। জন্ম হলো খারেজি, শিয়া, মু'তাযিলা, ক্বাদারিয়া, জাবরিয়াসহ বিভিন্ন ফিরকার।

মুসলিম আলিম ও চিন্তাবিদদের অনেকের মধ্যে গ্রীক দর্শন, বিশেষ করে অ্যারিস্টটলের মেটাফিযিক্যাল আলোচনা নিয়ে মুগ্ধতা ছিল।[৮] ভক্তিভরে অ্যারিস্টটলকে তারা 'প্রথম শিক্ষক' উপাধি দিয়েছিলেন। তারা ভেবেছিলেন, গ্রীক দর্শনের সাহায্য ছাড়া ইসলামি চিন্তা অপরিপক্ক ও অপরিপূর্ণ থেকে যাবে। তাই তারা ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের ওপর গ্রীক দর্শনের পোশাক চাপালেন। রচিত হলো বইয়ের পর বই। আজকের বিভিন্ন চিন্তাবিদ যেমন পশ্চিমা সভ্যতা ও চিন্তা নিয়ে মুগ্ধতাভরা ঘোরের মধ্যে থাকেন, তেমনিভাবে সেই যুগে গ্রীক চিন্তা ও দর্শন নিয়ে মুগ্ধতা ও মোহ কাজ করত। এই চিন্তাবিদরা গ্রীক দর্শনের আলোকে 'ইসলামি দর্শন' গড়ে তোলার চেষ্টা করলেন। আরেকদল বিভিন্ন আকীদাগত প্রশ্ন ও তর্কের নিরসনের জন্য অ্যারিস্টটলীয় যুক্তির কাঠামো অনুযায়ী গড়ে তুললেন কালামশাস্ত্র।

তারা ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বিশুদ্ধ, স্বাধীন অবস্থান ত্যাগ করলেন। ইসলাম শুধু শীতল, নীরস যুক্তিতর্কের দিকে মনোযোগ দেয় না। বরং মানব অস্তিত্বের সব দিককে আমলে নেয় সামগ্রিক ও পরিপূর্ণভাবে। কিন্তু ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের স্বতন্ত্র, স্বাধীন কাঠামো গড়ে তোলার বদলে তারা একে বসাতে চাইলেন দর্শনের সীমিত ছাঁচের ভেতর। ধার করা বিভিন্ন দার্শনিক ধারণার সাথে ইসলামের সামঞ্জস্য প্রমাণে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। তাদের শাস্ত্রের পরিভাষাগুলোও প্রায় পুরোপুরিভাবে ধার করা।

ঈমানের পদ্ধতি আর দর্শনের পদ্ধতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য আছে। ইসলামি আকীদা মহৎ সত্যের সন্ধান দেয়। অন্যদিকে ধর্মতাত্ত্বিক আর মেটাফিযিক্যাল আলোচনাতে থাকে কৃত্রিমতা আর বিভ্রান্তিতে ভরা তুচ্ছ কিছু কথাবার্তা। ইসলামি আকীদার সুসংহত

[৮] মেটাফিযিক্যাল (metaphysical) : মেটাফিযিক্স সম্বন্ধীয়। মেটাফিযিক্স (metaphysics)-এর বাংলা করা হয় অধিবিদ্যা। এটি দর্শনের ওই শাখা, যা প্রাথমিক মূলনীতিসমূহ (first principles) এবং সত্তা, অস্তিত্ব, জ্ঞান, পরিচয়, মন, সময়, বস্তু, স্থান, সম্ভাবনা-এর মতো বিভিন্ন বিমূর্ত ধারণা নিয়ে আলোচনা করে। (অনুবাদক)

কাঠামোর সাথে কথিত 'ইসলামি দর্শন'-এর সামঞ্জস্য ছিল না। এই 'ইসলামি দর্শন' ছিল ইসলামি বিশ্বাসের স্বচ্ছ স্রোতে দূষিত পানির মতো। এসব বুদ্ধিবৃত্তিক কারসাজি মানুষের মনে কেবল বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে, ইসলামি চিন্তার বিশুদ্ধতাকে নষ্ট করেছে। এর প্রশস্ততাকে সংকীর্ণ করে একে করেছে শুষ্ক এবং দুর্বোধ্য। জন্ম দিয়েছে অনর্থক জটিলতার। ইসলামি দর্শন আর কালামশাস্ত্র পুরোপুরিভাবে বিজাতীয়, আমদানি করা। প্রথম প্রজন্ম যেভাবে ইসলামকে বুঝেছিলেন, এগুলোর ধরন, পদ্ধতি, রীতি ও শিক্ষা তার চেয়ে একেবারেই আলাদা।

কথাগুলো অনেকের কাছে বিস্ময়কর লাগতে পারে; বিশেষ করে যারা 'ইসলামি দর্শন' চর্চা করেন ও নানা দার্শনিক আলাপ-আলোচনা পছন্দ করেন, তাদের কাছে। কিন্তু ইসলামি দর্শনের লেবেল লাগানো প্রতিটি বিষয় ছুড়ে ফেলা ছাড়া, কালামশাস্ত্রের সাথে যুক্ত প্রতিটি বিষয়কে বাদ দেওয়া ছাড়া এবং বিভিন্ন ফিরকার আবিষ্কৃত নানা যুক্তিতর্ক মুছে ফেলা ছাড়া ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউকে বিচ্যুতি ও বিকৃতি থেকে মুক্ত করা সম্ভব নয়। এগুলো বাদ দেওয়ার পরই কেবল আমরা কুরআনের কাছে ফিরে গিয়ে সরাসরি বিশুদ্ধ ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ গ্রহণ করতে পারব। জানতে পারব এর উপাদান ও অনন্য বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বৈশিষ্ট্য আলোচনার সময় অন্য ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সাথে মিল-অমিলের আলোচনা আসতে পারে, এতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এই ওয়ার্ল্ডভিউয়ের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো গ্রহণ করতে হবে সরাসরি কুরআন থেকে এবং সেভাবেই তুলে ধরতে হবে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে।

ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউ তুলে ধরার ব্যাপারে আমাদের পদ্ধতিকে বোঝার জন্য তিনটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে :

অধিকাংশ ফিরকার বিচ্যুতি এবং পারস্পরিক বিবাদের পেছনে গ্রীক দর্শন ও খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব থেকে আমদানি করা যুক্তি ও ধ্যানধারণার বড় ভূমিকা আছে। এসব নিয়ে বিভিন্ন ফিরকা যা কিছু লিখেছে, সেগুলোকে গ্রীক ও খ্রিষ্টানদের মূল আলোচনার ওপর ত্রুটিপূর্ণ টীকাটিপ্পনী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এসব যুক্তিতর্ক আবার নতুন করে আনার অর্থ হলো মানুষের মনে বিভ্রান্তি আর বিশৃঙ্খলা তৈরি করা, আর কিছু নয়।

গ্রীক দর্শন আর অ্যারিস্টটলের চিন্তাকে ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সাথে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা ছিল চরম মাত্রার ভুল, বোকামি। গ্রীক দর্শনের প্রকৃতি, এর পৌত্তলিক উৎস এবং এর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ ব্যবস্থা ও পদ্ধতির অনুপস্থিতির ব্যাপারে গভীর অজ্ঞতার ফলেই এধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছিল। গ্রীক দর্শনের সবগুলো বৈশিষ্ট্য ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বিপরীত।

গ্রীক দর্শনের জন্ম হয়েছিল মূর্তিপূজারী সমাজে। যে সমাজের পরতে পরতে মিশে ছিল পৌরাণিক কল্পকাহিনি আর চিন্তা। গ্রীক দর্শনের গাছ বেড়ে উঠেছিল সমাজের মধ্যে থাকা সর্বব্যাপী পৌত্তলিকতা আর গ্রীক পুরাণের নানা ধারণা শুষে নিয়ে। এর সাথে আপসহীন তাওহীদের ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠা ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের সমন্বয়ের চেষ্টা করার চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা আর কী হতে পারে!

খ্রিষ্টান ধর্মতাত্ত্বিকরা ব্যাপকভাবে গ্রীক দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিল। একারণেই দেখবেন গ্রীক দর্শনের পরের দিকের অনেক ব্যাখ্যাকার ছিল খ্রিষ্টান। এই খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ববিদদের রচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুসলিম দার্শনিক এবং কালামশাস্ত্রবিদদের অনেকে একসময় ধরে নিল—দার্শনিকদের (দার্শনিক মাত্রই তারা গ্রীক দার্শনিকদের বোঝাতেন) পক্ষে মুশরিক হওয়া সম্ভব নয়। আর এই ভুল ধারণার ওপর ভিত্তি করে তারা ইসলামি আকীদার সাথে মুশরিক গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তার সমন্বয়ের অসম্ভব প্রকল্প হাতে নিলেন। ইসলামি দর্শনের বিশাল একটা অংশ জুড়ে আছে এই ধরনের নিষ্ফল প্রচেষ্টার নানা ফলাফল।

উসমান (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতের পর ইসলামি বিশ্ব নানা সমস্যার মুখোমুখি হয়। অনেকে তখন কুরআনের প্রকৃত অর্থকে বাদ দিয়ে স্বার্থসিদ্ধির জন্য কুরআনের আয়াত ইচ্ছেমতো ব্যাখ্যা করতে শুরু করে। দর্শন ও কালামশাস্ত্র ব্যবহার করে বিভিন্ন ফিরকা সঠিক প্রমাণের চেষ্টা করে নিজ নিজ অবস্থানকে। এধরনের অধিকাংশ যুক্তিতর্ক ছিল একপেশে। তাছাড়া বিশুদ্ধ ইসলামি চিন্তাকে উপস্থাপনের জন্য এধরনের শাস্ত্রগুলো উপযুক্ত নয়। ইসলামি ওয়ার্ল্ডভিউয়ের বৈশিষ্ট্য আর উপাদানগুলো গ্রহণ করতে হবে সরাসরি কুরআন থেকে এবং তা করতে হবে এসব ঐতিহাসিক তর্কবিতর্কের কলুষতা থেকে মুক্ত হয়ে।

ইসলামের সঠিক বুঝ থেকে দর্শন আর কালামের উত্তরাধিকার সরিয়ে রাখাই উত্তম। তবে এই বিচ্যুতিগুলো নিয়ে ঐতিহাসিক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন, যাতে করে বিভিন্ন সময়ে উম্মাহর মাঝে মাথাচাড়া দেওয়া বিচ্যুতি এবং সেগুলোর কারণ শনাক্ত করতে পারি আমরা। ফলে আগেকার ভুলগুলোর ব্যাপারে সতর্ক হতে পারব, বিরত থাকতে পারব ইসলামি জীবনব্যবস্থা ও ওয়ার্ল্ডভিউয়ের আলোচনার ক্ষেত্রে একই ধরনের ভুল করা থেকে।

পশ্চিমা চিন্তাধারার বিকাশ হয়েছে তার নিজস্ব পথে। প্রথমে এর ভিত্তি ছিল শিরকি ধ্যানধারণা দ্বারা প্রভাবিত গ্রীক দর্শন। আধুনিক সময়ে এর ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে ক্যাথলিক চার্চ ও এর শিক্ষার বিরোধিতা। রেনেসাঁর সময় থেকেই ক্যাথলিক চার্চের বিরোধিতা পশ্চিমা চিন্তার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যে পরিণত হতে শুরু করে। সময়ের

পরিক্রমায় একসময় এটি রূপান্তরিত হয় সব ধর্ম এবং ধর্মীয় মতবাদের বিরোধিতায়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, রোমান ক্যাথলিক চার্চের মতবাদগুলো কখনোই নবি ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রকৃত শিক্ষার প্রতিনিধিত্ব করেনি। চার্চের প্রচারিত খ্রিষ্টবাদের জন্ম হয়েছিল শিরকি রোমান সাম্রাজ্যের ছায়ায়, যে সাম্রাজ্য খ্রিষ্টবাদকে রাষ্ট্রীয়ভাবে গ্রহণ করেছিল স্রেফ রাজনৈতিক কারণে। এই প্রক্রিয়ার ফলে ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর শিক্ষা বিকৃত হয় এবং প্রায় পুরোপুরিভাবে পালটে যায়। প্রথম দিকে এই বিকৃতি ঘটে রোমীয় পৌত্তলিকতার প্রভাবে। পরে চার্চ এবং চার্চের কাউন্সিল ওহি থেকে পাওয়া শিক্ষার সাথে যুক্ত করতে থাকে নানা বিজাতীয় ধ্যানধারণা। খ্রিষ্ট-ধর্মীয় আবেগকে ব্যবহার করা হয় রোমান সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য। ধর্মকে ব্যবহার করে ক্ষমতার বিভিন্ন দাবিদারদের দ্বন্দ্ব বন্ধ করার চেষ্টা করা হয়। বিভিন্ন ধরনের আকীদা ও মতবাদকে চার্চের অধীনে একত্রিত করে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টাও করা হয় এইসময়।[৯] কাজেই ক্যাথলিক চার্চের তৈরি করা খ্রিষ্টবাদের সাথে ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর প্রকৃত শিক্ষার খুব কমই মিল আছে।

এভাবে ক্যাথলিক চার্চ অস্তিত্ব ও মহাবিশ্বের ব্যাপারে বিভিন্ন বিকৃত ধ্যানধারণা এবং অবস্থান গ্রহণ করল। এটা হবারই ছিল। মানবীয় সব গবেষণা এবং জ্ঞান ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ। মধ্যযুগের ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা যখন এসব ভুল সংশোধনের চেষ্টা করল, চার্চ তখন তাদের বিরুদ্ধে নিল কঠোর অবস্থান। চার্চ শুধু আদর্শিকভাবে বিরোধিতা করে ক্ষান্ত হলো না, বরং সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যবহার করে বন্দি ও নির্যাতন করল ভিন্নমত পোষণকারীদের। অনেক ক্ষেত্রে হত্যাও করল।

সেই থেকে আজ পর্যন্ত ইউরোপীয় চিন্তা কেবল খ্রিষ্টধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়নি, বরং সব ধর্ম এবং ধর্মীয় ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা এমন সব চিন্তাধারা ও ধারণা গড়ে তুলেছে, যেগুলোর অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় চিন্তার বিরোধিতা এবং স্রষ্টা ও স্রষ্টার সাথে সম্পর্কিত সব ধরনের চিন্তাধারা মুছে ফেলার মাধ্যমে চার্চের কর্তৃত্ব নষ্ট করা। চার্চের কর্তৃত্ব সরাতে গিয়ে স্রষ্টার ধারণাকেই আসলে তারা আক্রমণ করে বসেছে। আধুনিক ইউরোপের বিভিন্ন দর্শন, মতবাদ এবং গবেষণা-পদ্ধতি সচেতনভাবে গড়ে তোলা হয়েছে ধর্মের বিরুদ্ধে। ধর্মবিদ্বেষ গেঁথে আছে ইউরোপীয় চিন্তার কেন্দ্রে, জ্ঞানের সংজ্ঞা এবং জ্ঞানার্জনের পদ্ধতির মধ্যে।

কাজেই ইউরোপীয় চিন্তাধারা এবং এর ফসলগুলোর মধ্যে ইসলামি চিন্তার ভিত্তি খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। পশ্চিম থেকে ধার করা ধ্যানধারনা দিয়ে ইসলামি চিন্তার পুনর্নির্মাণও সম্ভব নয়। সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন ইসলামি চিন্তক এধরনের প্রকল্প হাতে নিয়েছেন

[৯] টি ডব্লিউ আর্নল্ড, The Preaching of Islam, পৃষ্ঠা ৫৩।